শিক্ষা সমাজ দেশ

নিবন্ধ-রোমন্থন সময়ের প্রয়োজনে করতে হয়

– ড. হাসনান আহমেদ

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: **সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া পরিত্রাণ নেই**)

'নীল দর্পণ' নাটকে পড়েছিলাম 'কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে'। বাসি হয়ে ফললে লাভ তেমন কিছুই হয় না। পরে বোঝা যায় কাজটা করা উচিৎ ছিল। এতে অনুশোচনা জাগে। তাতে কী লাভ! সময়ের করণীয় সময়ে বোঝাটা জরুরি। এজন্য, বিশেষ করে দেশ-চালকদের দূরদর্শী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। লালন গেয়েছিলেন, 'অসময়ে কৃষি করে মিছামিছি খেটে মরে, গাছ যদিও হয় বীজের জোরে, ফল ধরে না, তাতে ফল...'। পত্রিকার পাতায় লিখতে গিয়ে কত বিষয়ে কত কথাই-না বিভিন্ন সময় লিখি, ক'জনইবা গুরুত্ব দেয়! তাই মাঝে-মধ্যে নিবন্ধ-রোমন্থন প্রয়োজন হয়। পতিত সরকারের সময় থেকেই এখনো অনেক কথা লিখে চলেছি। কথাগুলো ভেবে দেখার লোকজন কম। যাদের ভাবার জন্য লেখা হয়, বিষয়টা নিয়ে তারা ভাবেন না। বড়োজোর এক দল অন্য দলের দিকে প্রাবন্ধিককে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমালোচনায় নামে; কখনো নামের সাথে কটুক্তিসূচক ট্যাগ ঝুলিয়ে দেয়। যা হবার তা হতেই থাকে, যে যা করতে চায়, তা চলতেই থাকে। আমরাও নাছোড়বান্দা, আমাদের কথা আমরা বারবার বলতেই থাকি। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের মতো অনুকূল বা প্রতিকূল বাতাসে তো আমাদের মতো মাস্টার সাহেবদের জিভ কখনো ঘোরে-ফেরে না; এখানেই সমস্যা।

রাষ্ট্রপতি পদ, রাষ্ট্রের প্রধানের বড় সম্মানের পদ; সাথে দেশের মান-মর্যাদা জড়িত। উনি অতীতের-বলা কথার সঙ্গে বর্তমান-বলা কথার মিল রাখতে না পেরে বিপদে পড়ে গেছেন। এটা অনেকের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত তো বটেই। রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও কি শোভনীয়? ভাবতে খারাপ লাগে, আমারা দেশের 'মহান রাজনীতিকরা' সব সম্মানীত পদগুলোকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এত ঠুঁটো জগন্নাথ ও বালখিল্য বানিয়ে ফেলছেন কেন? আসলেই বিষয়টা চিন্তার উদ্রেক করে। আমরা ক্রমেই পদের মর্যাদাকে ছোট ও তুচ্ছ বানিয়ে ফেলছি। নাকী আমরা দেশীয় সব সরকারি ও রাজনৈতিক পদ অপাত্রে সমর্পণ করছি? মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বড়-কর্তা– কার কথার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি বলুন? কথার সাথে কাজের মিল পাওয়া দুষ্কর। দেশের প্রতিটি পর্যায়ে সাধারণ নেতা-গোতা ও সোস্যাল টাউটদের মধ্যে এ রোগের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। লিখে-রাখা কথাও উল্টিয়ে ফেলা হয়। দেশের মর্যাদার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়। একবার লিখেছিলাম, কে কোন দল করে তার ভিত্তিতে মানুষ ভালো-মন্দ বিচার নয়, যার মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ যত বেশি, সে তত ভালো মানুষ। মানুষ ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠিও আমাদের সমাজে পরিবর্তন করে ফেলেছি। সমাজকেও বিভক্ত করে ফেলেছি, সবই অধঃপতনের পথ।

দুর্নীতি দমনের কথা অনেকবার লিখেছি। অসুবিধা হচ্ছে, দুর্নীতি বলতে আমরা অনেক রকম দুর্নীতির মধ্যে মাত্র এক ধরনের দুর্নীতি অর্থাৎ 'আর্থিক দুর্নীতি'কে বুঝি। অথচ সব ধরনের দুর্নীতিতে দেশ সয়লাব, যা আমাদের ঘিরে ধরেছে। এসবের বেশি রকমফের তৈরিতে অধুনা পতিত সরকারের অবদানই বেশি। অন্যদের অবদানও নেহায়েত কম নয়। ভবিষ্যৎ আগন্তকদের জন্য এসব ট্রেনিং, পথ ও পদ্ধতি নিশ্চয়ই ধন্বন্তরি পাথেয় হিসেবে কাজে লাগবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে এ নিয়েই আমরা এদেশে আছি। 'ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল'। এতে ভুগছে একমাত্র দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষ। অন্তর্বর্তী সরকারের আগমনে টাকা পাচার, লুটপাট কমলেও ঘুষ-বাণিজ্যের রেট হয়তো বেড়ে থাকতে পারে। এ নিয়ে তারা কতটুকু উদ্বিগ্ন, জানা নেই। আরো কিছুদিন গেলে পরিষ্কার বোঝা যাবে। 'স্বভাব যায় ম'লে আর ইল্লত যায় ধুলে'। এ কথাও তো কতবার কত রকমের উদাহরণ দিয়ে, কখনো টিপ্পনি কেটেও বলেছি। অঙ্গচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কি পচন রোধ হয়? যদিও আমরা সে চেষ্টা করি। 'বাকির আশায় নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এ ভূবনে'– লালনের এ গান গেয়েও অনেকবার শুনিয়েছি। বুঝাতে চেয়েছি, এদেশের নব্বইভাগ মানুষ মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে সততা, ইমানি বৈশিষ্ট্য বিদায় নিয়ে তাদের অধিকাংশ ভোগবাদে নিমজ্জিত এবং

ধর্মের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তিকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমান সাতপুরুষ বসে খাওয়ার স্বপ্নে অবৈধভাবে সম্পদ মজুদের নেশায় মত্ত। অনেক দেশের অমুসলমানরাও তা করে না।

জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষার ঘাটতি হয়ে গেলে এসব নেশা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না, যার জন্য আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষার প্রবর্তন এবং সরষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভূত আগে তাড়াতে হবে; এর অর্থ পরিচালকদের 'আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর...' নীতি বাস্তবায়ন কর, হতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য সমমনা একদল লোক কই? রাজনৈতিক দলগুলোও এ নিয়ে ভাবে না। এসব বস্তাপচা-সেকেলে কথা ভেবে উড়িয়ে দেয়। আসলে জনগোষ্ঠীর মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার আপদ-মস্তক পচে গেছে। জনসম্পদ জন-আপদে পরিণত হয়েছে। এসব নিয়ে কারো কোনো টুঁ শব্দও নেই। সেজন্যই গত লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম, 'এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে'। আমি নিশ্চিত, ডাক্তার দক্ষ হলে রোগের নিরাময় এখনো সম্ভব; জাতীয় এ 'ক্যান্সারের' চতুর্থ ধাপ এখনো বাকি। কিন্তু দক্ষ ডাক্তার এদেশে কোথায়? সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক পজিটিভ পরিবর্তন এবং অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া দেশের এ নাভিশ্বাস দশা থেকে উত্তোরণের অন্য কোনো পথ এই ক্ষুদ্র মাস্টার সাহেব দেখে না। তাই তো বলছিলাম 'কাঙালের কথা বাসি হলেই ফলে'। আমি তো দেখি, ১৪ দল বাদে অন্তর্বর্তী সরকার ও বাকি দলগুলোর সম্মিলিত ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া এ অকূল-পাথার থেকে পরিত্রাণের পথ অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। দেশ ও জনসাধারণের মুক্তি মেলে এমন শুভবুদ্ধির উদয় কি রাজনৈতিক দলগুলোর সহজে হবে?

এ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযোগ ওঠা শুরু করেছে। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ-পরিদপ্তরের লোকজন ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছে না, অর্থাৎ ভাবছে, 'ক'দিন বাদেই তো এদের বিদায়; গোলেমালে কাটিয়ে দেবো এ ক'টা দিন'। বিভিন্ন কাজ দেখে আমার কাছে এমনটিই পরিস্ফুট হয়েছে। আরেকটা বিষয়, কয়েকজন উপদেষ্টার কর্মদক্ষতা। আমার পরামর্শ ছিল নিয়মিত একসাথে বসে অসুবিধাগুলো একে অন্যের সাথে খোলামেলা শেয়ার করা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা। মানুষ নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের দিয়ে দায়িত্বমতো কাজ করিয়ে নেওয়া অনেক কঠিন বিষয়; এখানে সবাই মাতব্বর। বিশেষ করে এদেশে, যেখানে কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধের ঘাটতি রয়েছে, নির্দিষ্ট রাজনীতিকদের লেজুড়বৃত্তি করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কর্তৃত্ববাদী প্রতিবেশী ও তাদের এদেশীয় দীক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ মদদ এবং বিভিন্ন বিভাগগুলো দুর্নীতিতে দীর্ঘদিন ধরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অন্তর্বর্তী সরকারকে ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এসব প্রতিকূল পরিবেশ শক্তহাতে মোকাবেলা করেই কাজ করে যেতে হবে। এজন্য শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী উপদেষ্টা আরো কয়েকজন নিয়োগ দিতে হবে। গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় হলো: যে কারণে সেই স্বাধীনতার পরপরই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে ২০২৪ সাল নাগাদ তার পূর্ণতা পেল, সেই ভিত্তিগুলো প্রয়োজনমতো সংস্কারের মাধ্যমে দুর্বল বা উচ্ছেদ করতে আমরা পারছি কিনা, তার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতে আবার এদেশে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে কি না সে বিষয়টি। এ জটিল অবস্থাকে সামাল দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন বলে আমি আদৌ বিবেচনা করি না। এ মুহূর্তে এদেশের সামনে আর কোনো বিকল্প দেখিনে। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি, এটা এদেশের ছাত্র-জনতার বিপ্লব। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে দেড় যুগ আগে। এ সরকারের নাম 'বিপ্লবী সরকার' হওয়াই বাঞ্চনীয়; এতে দেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার অনেক সুবিধা আছে। আমার মতো অখ্যাত মাস্টার সাহেবের লেখাগুলো এতদিন ধরে নীতিনির্ধারকরা গুরুত্ব দিলে এবং বর্তমানে কিছু উপদেশ নিলে নিশ্চিতভাবেই দেশ উপকৃত হতো।

সংবিধান পরিবর্তন নিয়েও অনেক কথা লিখেছি। বিচারপতি অপসারণে 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' পুনর্বহালের রায় আমাকে আশান্বিত করেছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত আমার প্রস্তাব ছিল: রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' নাম থেকে 'জুডিশিয়াল' শব্দটা মুছে দিতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজনৈতিকভাবে একজনকে মনোনীত না করে অরাজনৈতিক 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠন করে এর কাজের আওতাকে

অনেক বাড়াতে হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে হবে সরকার প্রধান। উভয়ের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে ভারসাম্য থাকতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় কার্যত রাষ্ট্রের বলতে কেউ নেই, সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তি। বিচার বিভাগসহ সরকারের নির্বাহী, আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণের কাজও 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর হাতে দিতে হবে। সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধীদলের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণও এ কাউন্সিল করবে। সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে সরকারি ও বিরোধী দলের সকল অপকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। এতে সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সব অপকর্ম বন্ধ হবে। এক-ব্যক্তিভিত্তিক দলীয় ব্যক্তিকে সাক্ষিগোপাল হয়ে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বুঝতে হবে স্টিয়ারিং ছাড়া আমাদের রাজনীতির গাড়ি তেপ্পান্ন বছর ধরে চলছে। সেজন্য এত সমস্যা, দুর্নীতি, লুটপাট, গণহত্যা; বলতে গেলেই নির্যাতন, গুম। এভাবে কোনো দেশ চলতে পারে না, চলা উচিৎও নয়। আবার প্রেসক্রিপশনের দায়িত্ব রোগীকে দিলে সে রোগ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, বরং রোগী মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য অনেক অপ্রিয় সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারকেই করতে হবে। এসব অনেক কটু কথা পতিত সরকারের সময় থেকেই লিখে আসছি। সুপ্রিম কাউন্সিল ১৫ থেকে ২১ সদস্যের অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর জন্য অরাজনৈতিক নির্বাচকমণ্ডলীও থাকবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে রাষ্ট্রের রক্ষক, সরকার হবে রাজনৈতিক। এ বিষয়ে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল' (১০.৯.'২৪) এবং 'রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা' (২৮.৮.'২৪) শিরোনামে এ পত্রিকাতেই কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিখেছিলাম। এ পথে গেলে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনার আর দরকার হয় না; এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যায়। রাজনীতিতে অর্থের অবৈধ লেনদেন বন্ধ হয়, দেশব্যাপী শৃঙ্খলা ফেরে এবং সুশিক্ষিত ও সৎ মানুষ ক্রমেই রাজনীতিতে আসে।

প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের রাজনীতিকরা কি আসলেই অন্তর থেকে এসব চান? এত ক্ষুদ্র একটি দেশ, যথাযথ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কিইবা এমন কঠিন কাজ! অসুবিধা হলো রোগী ওষুধ খেতে চায় না। ওষুধ খেলে ধান্দাবাজি বন্ধ হয়ে যায়। কতদিন আর পথের দিকে অনিমিখ তাকিয়ে থাকা যায়! হয়তো অত্যুক্তি হবে, তিনশ' টাকার স্ট্যাম্পের ওপর নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, আমাদের পরামর্শমতো যদি আইন ও বিধি পরিবর্তন করা হয়, নীতিমালা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এদেশের মানুষ বাঞ্ছিত সুশিক্ষার ও উন্নয়ন-পথের নিশ্চিত সন্ধান পাবে এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হবে। অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে শিক্ষিত-সৎ মানুষের চেয়ে লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান ও ঘুষখোরদের কদর বেশি, এটা বড্ড দুঃখের বিষয়। আরো সত্য বললে, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত টাকা ও স্বার্থের জোগান দিয়ে পরাধীনতার নিগড়ে এ দেশকে বাঁধার জন্য এদেশের অনেক মানুষ ও গোষ্ঠীকে কিনতে পাওয়া যায়। এসব থেকে নিস্তার পাওয়ার একটাই পথ, জোর করে হলেও দেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলবত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন, নীতি-নির্ধারণ, সমন্বয়সাধনের ও অন্য আরো অনেক কার্যাবলি সাধনের জন্য স্থায়ী 'শিক্ষা কমিশন' গঠন করা। এসবের মডেল ইতোমধ্যেই এ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

(২৭ অক্টোবর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ